ISSN 2072-3334
Development Compilation
Volume 10. Number 02. March 2014

সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ধর্মান্তর ও অবস্তুগত সাংস্কৃতিক সংকট বিশেণ্ঢষণ

শামীম আহমেদ*

Abstract : Santal is one of the minor communities of Bangladesh, belonging a separate culture and tradition that helps to identify them as indigenous community. But now their culture is under turmoil and transition. so the transformation of santal culture faces a good deal of opposition conflict and disbelief due to many socio-economic and political factors. This study aims reviewing some of the non-material cultural changes to understand the agents of all these social changes, along with the interacrion of tradition and modernization. 25 convertated santal respondent has been selected by purposive sampling. Data has been collected through indept interview, questionnaire, observation and FGD.

সাঁওতাল বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং বাংলাদেশী জাতিসত্ত্বার অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোরেশী (Qureshi eds.1948:15) এদেশে আদিবাসীর সংখ্যা ৩১টি উলেণ্ঢখ করলেও ১৯৯১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদনে এদের সংখ্যা ২৭টি উলেণ্ঢখ করা হয় (BBS,1991)। বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলার যে অংশকে বরেন্দ্র নামে অভিহিত করা হয়, সেখানে ওঁরাও, রাজবংশী, হো, মুণ্ডা, পাহাড়িয়া, মাহালি, কোচ প্রভৃতি আদিবাসীর সাথে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করছে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী (শাহানা, ২০০৪:১৬৭)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো অনুসারে সমগ্র বাংলাদেশের সাঁওতাল পরিবারের সংখ্যা ৪০৯৫০ টি এবং জনসংখ্যা ২৯২৭৪৪ জন (BSB,1996:148)। বাংলায় এ ধরনের জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী, উপজাতি, বনবাসি, পাহাড়ি বা জংলি নামে অভিহিত করা হলেও সাম্প্রতিককালে নৃবিজ্ঞানীরা (চৌধুরী, ২০০০:১৯, করিম, ২০০০) এ জাতীয় শব্দগুলো মূল্যবোধ নিরপেক্ষ তথা বিজ্ঞানসম্মত না হওয়ায় সেসব পরিহার করে নৃগোষ্ঠী (Ethnic) শব্দটি ব্যবহারের পক্ষে (শাহানা, ২০০৪:১৬৭)। কারণ দীর্ঘকাল ধরে এদেশের মাটিতে বসবাস করার জন্য তাদেরকে আদিবাসী হিসাবে উলেণ্ঢখ করা যায়, তবে আদিবাসী শব্দের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করলে এরা আদিবাসী কোটায় পড়েনা, কারণ তাদের আদি বাসস্থান এখানে নয়, Bessaignet উলেণ্ঢখ করেছেন সাঁওতাল গোষ্ঠি ঐতিহাসিক কালের প্রথমভাগে, মধ্য ও পূর্ব ভারতের ছোট নাগপুর, দামন-ই-কোহ (বর্তমান সাঁওতাল পরগানা) প্রভৃতি অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে (Bessaignet,1960:152) তবে কখন কিভাবে তারা এই উপমহাদেশে এসেছিল তা নিয়ে নৃবিজ্ঞানী, ভাষাবিজ্ঞানী ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, সুদূর থেকে এসে ভারতবর্ষে বসতি গড়ে তুলেছিল (Hunter1868:147,Dalton,1872:209-211)।

* সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পরে তারা অবর্ণনীয় খাদ্যাভাবের সম্মুখিন হয়। তখন তাদের অনেকেই সাঁওতাল পরগণায় থাকা নিরাপদ মনে না করে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশের সাঁওতালদের অধিকাংশই ছোট নাগপুর ও সাঁওতাল পরগণা থেকে এসেছে, তাদের বসবাস সাঁওতাল পরগণার সাথে বরেন্দ্র অঞ্চলের মিল থাকায় এবং জঙ্গলময় পতিত অনুর্বর জমি চাষোপযোগী করে জীবিকা নির্বাহ তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সহজ হওয়ায় তারা বরেন্দ্র অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে বসতি গড়ে তোলে (Carter, 1928:152-7)। সম্ভবত এই প্রেক্ষিতেই রাজশাহীর বরেন্দ্র এলাকা সাঁওতালদের নতুন আবাসস্থল হয়ে ওঠে, তাই তারা আদি বাসস্থান ব্যতীত আদিবাসী (প্রফুলণ্ঢ, ১৯৯৮:১৪৫)। বাংলাদেশের অনুস্বাক্ষরিত শ্রম সংস্থা (ILO) সনদের ১০৭ ধারা অনুযায়ী, কোন জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী হিসাবে পরিগণিত হতে হলে তাদের হাজার বছর ধরে কোথাও বসবাস করার প্রয়োজন নেই যেমনটা প্রয়োজন হয় আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে। কনভেনশন অনুযায়ী উপনিবেশায়ন বা দখলাধীন হওয়ার সময় (যেমন-১৮ বা ১৯ শতক) সেখানে তাদের বসতি থাকা এবং প্রাক উপনিবেশিক সময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অনুগামী কীর্তি ও প্রথার অনুসারী হওয়াই আদিবাসী বলে গণ্য হওয়ার আবশ্যকীয় শর্ত (রায়, ২০১১)। বাংলাদেশী আদিবাসীদের অবস্থান সেই শর্তের সঙ্গে মানানসই। বেশিরভাগ আদিবাসীই গোত্র প্রথা ও টোটেমবাদে বিশ্বাসী। সাঁওতালরা ১২ টি গোত্রে বিভক্ত, সাঁওতালী ভাষায় এই গোত্রগুলোকে প্যারিস বলে। মানুষ তার পরিচয় নির্মাণে আর কর্মময় জীবনে যা কিছু সৃষ্টি করে তাই তার সংস্কৃতি। সাঁওতালদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা, ধর্ম, কলা, বস্ত্র, নাচ, গান, বাদ্য, খাদ্য, নিয়ম-নৈতিকতা ও মানসিক দিক। কিন্তু বেঁচে থাকার তাগিদে তাদের এই সংস্কৃতি প্রতিনিয়ত বদল হয়ে যাচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে। পরিবর্তন প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম ও প্রকৃয়া, তবে অনেক সময় কোন কোন পরিবর্তনের পেছনে থাকে সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা। অর্থনৈতিকভাবে দূর্বল, অনাহারী-অর্ধাহারী, আদিম চিন্ড্র-চেতনার উত্তরাধিকারী, সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জীবনে প্রকৃত আঘাত এসেছে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে। হাজার বছর ধরে তারা যে জীবন প্রণালী অনুসরণ করে এসেছে আজ তার অনেক কিছুই রূপান্ড্রিত ও পরিবর্তিত। তাদের জীবন ধারা ক্রমশই বদলে যাচ্ছে। ফলে সংকটে পড়ছে সামগ্রিক জীবনবোধ ও দর্শন।

গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ

১. সাঁওতালদের জীবনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রসমূহ উদঘাটন ।
২. পরিবর্তনশীল অবস্তুগত সাংস্কৃতিক অবস্থা অনুসন্ধান।
৩. সাঁওতাল সংস্কৃতি পরিবর্তনে ক্রিয়াশীল উপাদান চিহ্নিত করা।

গবেষণা পদ্ধতি

এলাকা নির্বাচন- গবেষণা বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গ্রাম ও শহরের দুটি সাঁওতাল পলণ্ঢী নির্বাচন করা হয়। শহরের ক্ষেত্রে কোর্ট মিশন পাড়া খ্রিস্টান পলণ্ঢী, এটি রাজশাহী সদর জেলা জজ আদালত থেকে ১০০ গজ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে ৪৬টি পরিবারে ২৭০ জন বাস করে আর সবগুলো ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান পরিবার। পলণ্ঢীটি সম্পূর্ণ মিশনের অর্থে কেনা আর সার্বিক তত্ত্বাবধান মিশনই করে। আর গ্রামের ক্ষেত্রে জুগিডাঙ্গা গ্রামকে নির্বাচন করা হয়, গ্রামটি চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানার অর্ন্তগত নয়াগোলা পোস্টঅফিস থেকে ১৩০ গজ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে মোট পরিবারের সংখ্যা ৪২ আর সদস্য সংখ্যা ৩০০ জন। এখানে ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান পরিবার ও চিরায়ত সাঁওতাল পরিবার

উভয় একত্রে বসবাস করে। এখানে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন পেশার মানুষ এবং অধিকাংশ নারীরাই বিভিন্ন প্রকার আয় উপার্জন কর্মে নিয়োজিত।

গবেষণাটির ক্ষেত্রে গুণগত এবং পরিমানগত তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে, এছাড়াও তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস ব্যবহৃত হয়। গবেষণাটি পরিচালনার জন্য নিবিড় সাক্ষাৎকার, কাঠামোবদ্ধ ও অকাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালা এবং পর্যবেক্ষণ কৌশলের মাধ্যমে প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহিত বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত যাচাই, ক্রসচেক ও সমীক্ষিত জনগোষ্ঠীর মতামত, বক্তব্য-পরামর্শ ও প্রস্তাবনা সংগ্রহের জন্য দলগত আলোচনা (F.G.D) আয়োজন করা হয়। কোর্ট মিশন পাড়া পলণ্ডী থেকে Random Sampling এর মাধ্যমে ৪৬টি পরিবারের মধ্যে থেকে ৭টি পরিবার নির্বাচন করা হয়, আর উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচিত পরিবারগুলো থেকে ১৩ জন (বয়স, লিঙ্গ, পেশা এবং শিক্ষার ভিত্তিতে) উত্তরদাতা হিসাবে নির্বাচন করা হয়। এদের মধ্যে ৮ জন পুর"ষ (৬১.৫৩%) এবং ৫ জন মহিলা (৩৮.৪৭%)। গ্রামের ক্ষেত্রেও Random Sampling মাধ্যমে ৭টি পরিবার নির্বাচন করা হয়, আর নির্বাচিত পরিবারগুলো থেকে আবারো উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে ১২ জন উত্তরদাতাকে (বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষা এবং পেশা) ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়। এদের মধ্যে ৮ জন পুর"ষ (৬৬.৬৭%) এবং ৪ জন মহিলা (৩৩.৩৩%)। গ্রাম এবং শহর মিলে মোট উত্তরদাতা ২৫ জন, এদের মধ্যে পুর"ষ ১৬ জন (৬৪%) এবং মহিলা ৯ জন (৩৬%)।

উত্তরদাতাদের বয়স ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস

বয়স	সংখ্যা	শতকরা
২১-৩০ বছর	৩	১২%
৩১-৪০ বছর	১২	৪৮%
৪১-৫০ বছর	৮	৩২%
৫০+	২	৮%
মোট	২৫	১০০%

ধর্মান্তর বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারা নিয়ে প্রশ্ন থাকায় উত্তরদাতা হিসাবে ২০ বছরের নিচের বয়সকে বিবেচনা করা হয়নি।

শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে উত্তরদাতাদের শ্রেণীবিন্যাস

শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা	শতকরা
অক্ষর জ্ঞান শূন্য	৯	৩৬%
প্রাথমিক শিক্ষা	৭	২৮%
মাধ্যমিক শিক্ষা	৩	১২%
উচ্চ মাধ্যমিক	৩	১২%
সম্মান শ্রেণী	২	৮%
সম্মানোত্তর	১	৪%
মোট	**২৫**	**১০০%**

পেশার ভিত্তিতে উত্তরদাতাদের শ্রেণীবিন্যাস

পেশা	সংখ্যা	শতকরা
কৃষিকাজ	১৫	৬০%
মজুরি শ্রমিক	৫	২০%
ব্যবসা	২	৮%
চাকুরি	৩	১২%
মোট	২৫	১০০%

উত্তরদাতাদের শ্রেণীবিন্যাস

শহর	পুর"ষ	মহিলা	মোট	শতকরা
শহর	৮	৫	১৩	৫২%
	৬১.৫৩%	৩৮.৪৭%		
গ্রাম	৮	৪	১২	৪৮%
	৬৬.৬৭%	৩৩.৩৩%		
মোট	১৬	৯	২৫	১০০%
	৬৪%	৩৬%		

অবস্তুগত সাংস্কৃতিক সংকটের ক্ষেত্রসমূহ

সংস্কৃতি একটি জটিল ও বিশেষ ধরনের সামগ্রিক-সত্ত্বা (Existonce) যার মাধ্যমে বিকশিত ও সংশেণ্ডষিত হয়েছে জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্প, নৈতিকতা, আইন, রীতি-নীতি এবং অনুষঙ্গিক কর্মদক্ষতা ও অভ্যাস, যেগুলো মানুষ মানবসমাজের সদস্য হিসেবে অর্জন করেছে। সংস্কৃতির রয়েছে দুটি ব্যবহারিক দিক যথা- বস্তুসম্পদ এবং তার থেকে বিবর্তিত ভাবসম্পদ বা অবস্তুগত সম্পদ। মানুষের হাতের প্রত্যক্ষ স্পর্শে প্রকৃতি বা পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের রূপান্তরকেই বলে বস্তুগত সংস্কৃতি, এর মধ্যে রয়েছে-খাদ্য, পোশাক, খেলাধূলা, অঙ্গভঙ্গিমা, অস্ত্রশস্ত্র, অলংকার, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি। অপরপক্ষে প্রতিটি মানব সম্প্রদায় বিশেষ জ্ঞান, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের অধিকারী, এই স্পর্শাতীত বিষয়গুলো অবস্তুগত সংস্কৃতি, এগুলো হল শিল্প, সাহিত্য, নৃত্য, গীত, আইন, নীতিবিজ্ঞান, বিশ্বাস, সংস্কার, জাদু , ধর্মীয় চিন্তাধারা, সামাজিক রীতি-পদ্ধতি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনা এবং সংগঠন। এই নিবন্ধে আলোচিত বিষয় হল অবস্তুগত সংস্কৃতি।

শিশুর জন্মকেন্দ্রীক অনুষ্ঠান

সাঁওতালরা সন্তান প্রসবকালে প্রসূতিমার জন্য কোন স্বতন্ত্র আতুরঘর নির্মাণ করে না, সন্তান জন্মদানের সময় প্রসূতির দেখাশুনাসহ নবজাতকের নাড়িকাটা ও অনান্য তাৎক্ষনিক কাজগুলো সাধারণত সমাজের বয়স্ক মেয়েরাই পালন করে। প্রসূতির অবস্থা সংকটাপন্ন হলে ডাকা হয় তাদের সমাজের ওঝাকে। ওঝা মন্ত্রপূত, তেলজল, গাছ-গাছড়া, লতা-পাতার তৈরী ঔষুধ অথবা ঝাঁড়ফুঁক করে প্রসূতিকে সুস্থ করার চেষ্টা করে। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে ধাত্রী নবজাতকের নাড়িরজ্জু কাটে, ছেলেদের নাড়ি কাটার ক্ষেত্রে তীর-ধনুকের অগ্রভাগের লৌহ নির্মিত ধারালো অংশ এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ঝিনুক ব্যবহার করা হয়। তারা বিশ্বাস করে ধনুকের অগ্রভাগের ধারালো অংশ দিয়ে নাড়ি কাটলে সে ছেলে বড় হয়ে দক্ষ তীরন্দাজ হবে এবং মেয়েটি ঝিনুক কুড়ানি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করবে। তারা শিশুর কাটা নাড়ি কোথাও নিক্ষেপ না করে ঘরের চালের দরজার মধ্যখানে গুঁজে

রাখে অথবা ঘরের প্রধান দরজার কাছে পুঁতে রাখে এতে প্রসূতি ও নবজাতক অপদেবতার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে বলে তাদের বিশ্বাস। এছাড়াও অপদেবতার অশুভ দৃষ্টি থেকে মুক্ত থাকার জন্য নবজাতকের খাটিয়ার নিচে সবসময় একখন্ড লোহা রাখা হয়।

গবেষণাধীণ এলাকায় এ প্রসঙ্গে জানা যায় যে, এখন সন্তান জন্মোদানের ক্ষেত্রে মিশনই সব দায়িত্ব পালন করে। প্রসবকালে অভিজ্ঞ চিকিৎসক বা ধাত্রির দ্বারা প্রসবের সব কাজ করা হয়, তবে প্রসবকালীন জটিলতা দেখা দিলে বর্তমানে তারা স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে নিয়ে যায়, এরূপ সচেতনাতার মূলে রয়েছে মিশনারীদের ভূমিকা। শিশু জন্মগ্রহণের এক মাসের মধ্যে শিশুকে খ্রিস্টান ধর্মে আবগাহন করা হয়। এসময় নতুন পিতা-মাতা তৈরি করা হয় কারণ আসল পিতা-মাতা মারা গেলে এই পিতা-মাতা শিশুর দায়িত্ব নিতে পারে।

শিশুর নামকরণ

সাঁওতালরা শিশুর নামকরণকে কেন্দ্র করে এক জাঁক-জমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যা নার্তা নামে পরিচিত। সাধারণত শিশুর বয়স তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, তবে কখনও কখনও এর ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। সাঁওতাল সমাজে পূর্বপুরুষের নাম অনুসারে শিশুর নামকরণর করা হয়, নবজাতক পুত্রসন্তান হলে পিতামহের এবং কন্যাসন্তান হলে তার নাম মাতামহীর নামের সঙ্গে মিল করে রাখা হয়।

গবেষণাধীন এলাকায় এখন খুব অল্প সংখ্যক মানুষ দাদা-দাদী বা নানা-নানীর নামের স্মরণে তাদের সন্তানের নাম রাখে। খ্রিস্টান সাঁওতালরা অনেক সময় নামকরণে ফাদারের ওপর নির্ভরশীল। ফলে নামকরণে সাঁওতালী ঐতিহ্য এবং ধারা বজায় থাকছে না বরং নাম রাখার ব্যাপারে পাশ্চাত্য রীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। ধর্মান্তরিত সাঁওতাল ব্যক্তিবর্গের নামকরণ হচ্ছে এভাবে- ডেভিড, মাইকেল, লরেন্স। ফলে দেখা যাচ্ছে সাঁওতালী ঐতিহ্য বিলুপ্ত হচ্ছে কিন্তু খ্রিস্টান নামের পাশে সাঁওতালী পদবী ব্যবহৃত হচ্ছে যেমন-জোনাথন হেমবন,জেমস সরেণ ইত্যাদি।

ধর্মবিশ্বাস, পূজা-পার্বণ ও ব্রত অনুষ্ঠান

সাঁওতালদের মধ্যে অলৌকিকতা, যাদুবিদ্যা, আচার-অনুষ্ঠান এবং টোটেমবাদ রয়েছে, যাকে নৃবিজ্ঞানীরা বলে ধর্ম নামক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সাঁওতালী ভাষায় দেবতাকে বলা হয় বোঙ্গা। তাদের বিশ্বাস সমাজ জীবনের সব মঙ্গল-অমঙ্গল বোঙ্গার সন্তুষ্টির ওপর নির্ভরশীল, তাই বোঙ্গাকে খুশি রাখার জন্য বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পূজা পার্বণ পালন করে। সাঁওতালদের আদি দেবতা হলো 'সিং বোঙ্গা' বা সূর্য, 'সিং বোঙ্গাকে' তাঁরা "ঠাকুর" বলে সম্বোধন করে। সূর্য পূর্বদিকে উদয় হয় বলে সাঁওতালদের কাছে পূর্বদিক পবিত্র, পূজা করার সময় বা কোনো শপথ নেওয়ার সময় তারা পূর্বদিকে মুখ করে বসে। সিং বোঙ্গা ছাড়াও তাদের আরো অনেক দেবতা রয়েছে যেমন-মারাং বুরো, ওয়াক বোঙ্গা, চান্দো বোঙ্গা, দা বোঙ্গা, দাদ্দি বোঙ্গা, পাকরি বোঙ্গা, জাহের এরা ইত্যাদি (Hunter,1886:182, Datta Majumder,1956:48)। তারা দেবতা ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার অপদেবতায় বিশ্বাসী, এদের মধ্যে রয়েছে-অ্যাবগে (Hunter,1868,184) রাকা, একগুড়িয়া বা ঘোরমুহ, কুরিণ এবং ভূত ।

সাঁওতাল সমাজে লৌকিক হিন্দু দেব-দেবীর প্রভাবও দেখা যায়, সাঁওতালরা আসলে ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকে সর্বপ্রাণবাদী ও প্রকৃতির উপাসক, আবার তারা ঠাকুর জিউ'কে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে মান্য

করে। তাদের ধর্মাচারণে প্রতিমা পূজার প্রচলন নেই, তাদের আরও একটি উলেণ্ডখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- নারী-পুরুষ উভয়েই উল্কি-চিহ্ন আকেঁ। পুরূষরা বাম হাতে বিজোড় সংখ্যা যেমন-তিন, পাঁচ,সাত কিংবা উর্ধ্বে নয়টি উল্কি আঁকে। বিজোড় সংখ্যা উল্কি সম্পর্কে তাদের মতামত হচ্ছে এর দ্বারা তারা প্রথমটি জীবন, দ্বিতীয়টি মরণ, আবার তৃতীয়টি জীবন, চতুর্থটি মরণ এভাবে সবগুলো উল্কির অর্থের ইঙ্গিত দেয়। সাঁওতালী ভাষায় উল্কিকে সিকচিহ্ন বলা হয়। মেয়েদের উল্কি আকাঁ হয় উভয় হাতের কব্জিতে, বাহুতে, এমনকি বুকে, বারো থেকে চৌদ্দ বছরের মধ্যে তাদের এসব উল্কি আঁকা হয় অর্থাৎ উল্কি চিহ্ন দেখলেই বোঝা যায় যে, তারা বয়োপ্রাপ্ত অর্থাৎ বিবাহযোগ্য হতে চলেছে।

Hunter সাঁওতালদের ঐতিহ্যবাহী ১০টি উৎসব সনাক্ত করেছেন, মূলত দেবতাদের আর্শীবাদ কামনা এবং অপদেবতাদের রোষানল থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যই এ উৎসব।

সাঁওতালী উৎসবের তালিকা

উৎসব	উৎসবের মাস	উপলক্ষ্য
সোহরাই	ডিসেম্বর-জানুয়ারি (পৌষ-মাঘ)	ফসল কাটা উৎসব
সাকরাট	জানুয়ারি (পৌষ)	শিকার ও পূর্বপুরূষের উপাসনা
যাত্রা	ফেব্রুয়ারি (ফাল্গুন)	আনন্দ উৎসব
বাহা	ফেব্রুয়ারি (ফাল্গুন)	বসন্ত উৎসব
পাতা	মধ্যে-এপ্রিল (বৈশাখ)	ধর্মীয় উৎসব
এরক-সিম	জুন (আষাঢ়)	বীজ বপন উৎসব
হাড়িয়াড সিম	জুলাই (শ্রাবণ)	ধান লাগান উৎসব
ছাতা	অক্টোবর-নভেম্বর (কার্তিক)	ধর্মীয় উৎসব
ইড়ি গুন্দলি	নভেম্বর (কার্তিক)	শস্য উৎসব
হরো	নভেম্বর- ডিসেম্বর (কার্তিক-অগ্রহায়ন)	ধান পাকা উৎসব

সূত্র-Hunter,1868:463

সোহরাই

সাঁওতালদের সর্ববৃহৎ উৎসব সোহরাই যা পৌষ মাসে পালিত হয়। ফসল ঘরে তোলার জন্য ফসল দেবতাকে ধন্যবাদ জানানোই এ উৎসবের মূল উদ্দেশ্য, সপ্তাহব্যাপী চলে এ উৎসব । সোহরাই উৎসবের প্রধান পূজোটাই হয় প্রথম দিনে, সে পূজা দেখা মেয়েদের নিষিদ্ধ। এ পূজায় আতপ চাল, সিঁদুর ও অন্যান্য উপকরণ বোঙ্গার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। আলাদা আলাদা মুরগি বলি দিয়ে মুরগির রক্ত বেদির এক একটি খোপে লেপে দেওয়া হয়, তারপর বেদির অদূরেই মুরগি ও পোলাও রান্না করে সকলকে খাওয়ানো হয়। আপ্যায়ন পর্ব শেষ হলে বাড়ির মালিকের নির্দেশে প্রতি বাড়ির রাখালেরা গাভীর মাথায় তেল মেখে গাভীগুলোকে পূজার স্থানে নিয়ে আসে। পূর্বে একটি বিশেষ স্থানে মুরগির ডিম স্থাপন করা জায়গায় গাভীগুলোকে তাড়া করে নিয়ে যায় , যে গাভী প্রথমে ডিম ভাঙে বা ডিম স্পর্শ করে সে গাভীর মালিককে ভাগ্যবান মনে করা হয়। উৎসবের দ্বিতীয় দিনে নিজ নিজ বাড়িতে পূজা হয়। সাহরাই উৎসবের পঞ্চম দিনে পাড়ার সকলে মিলে নদীতে বা খালে-বিলে মাছ ধরতে যায়, মাছ ধরার পর মাঝিহাড়ম সে মাছগুলো গ্রামের অংশগ্রহণকারীদের পরিবার অনুসারে ভাগ করে দেয়। উৎসবের ষষ্ঠ দিন তাদের সকলে নিজের বাড়িতে খাবার না খেয়ে প্রতিবেশীদের বাড়িতে খাবার খায়। এভাবেই শেষ হয় সোহরাই উৎসবের মূল পর্ব।

বাহা উৎসব

সাঁওতালী ভাষায় বাহা শব্দের অর্থ ফুল, ফাল্গুন মাসে এ উৎসব পালিত হয়। তাই কেউ কেউ একে বসন্ত উৎসব আবার কেউ একে পুষ্প উৎসব বলে, তবে এ উৎসবের পূর্বে সাঁওতাল মেয়েরা কোনো ফুল ব্যবহার করতে পারে না।

সাঁওতালদের মাঝে এখন পরবগুলো আর আগের মত উদযাপিত হয় না, সাঁওতাল নারীরা সোইরাই উৎসবের গোবর ছিটানোর পরিবর্তে এখন গোবর লেপে পবিত্রতার কাজ করে, তাছাড়া সোহরাই সাতদিনব্যাপি অনুষ্ঠান হলেও বর্তমানে প্রথম দিনেই অনেকে আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে নেয়। বর্তমানে খ্রিস্টান হবার পর থেকে তারা এই অনুষ্ঠানগুলো আর পালন করে না। ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান সাঁওতালদের জীবনের সবচেয়ে বড় উৎসব -বড়দিন। তারা এখন বড়দিন পালন করে।

ধর্মীয় শিক্ষা

ঐতিহ্যবাহী চিরায়ত সাঁওতাল প্রথানুসারে একজন বালক তার পিতার কাছ থেকে পারিবারিক ঐতিহ্যগত নিয়মাবলী, দেবতার নাম, পূজার নিয়মকানুন, শ্রদ্ধা জানানোর উপকরণ ইত্যাদি শিখে থাকে, এজন্য পারিপার্শ্বিকভাবে উদযাপিত আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান পালনের সময় পুত্র-সন্তানকে সাথে রাখা হয়। যাতে পরবর্তীতে পিতার মৃত্যুর পর ওই সন্তানই পূজা অর্চনা করে। এছাড়াও গ্রামে একজন পুরোহিত থাকত, যিনি গ্রামের যুবকদের সপ্তাহে এক বা দুই দিন ধর্মীয় জ্ঞান দান করতেন, যেখানে বিভিন্ন সৃষ্টিতত্ত্ব, ইতিহাস, কেচ্ছা কাহিনী, পৌরানিক কাহিনী, দেবতার ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হত।

সাঁওতালদের জন্য যে কোন বিচারেই ধর্মীয় শিক্ষা ছিল অতীব জরুরী, একজন উঠতি যুবককে সাঁওতালদের সৃষ্টিতত্ত্ব, আদি পিতামাতার পরিচয়, পৃথিবীতে আগমনের ইতিহাস এবং ঋতুভিত্তিক বারো মাসের তের পার্বণের বর্ণনা দিতে হত কিন্তু এরকম উৎসব এখন আর পালন করা হয় না বলে গবেষণায় জানা যায়।

বিবাহ

বিবাহকে সাঁওতালী ভাষায় বলে বাপলা। সাঁওতাল সমাজের বিবাহ পদ্ধতির সবটাই লোকাচার নির্ভর, তবে এ সমাজে একই গোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ, এমনকি একই প্রধান গোত্রের উপগোত্রগুলোর মধ্যেও বিবাহ নিষিদ্ধ। আবার সংস্কারমূলক ধারণার জন্য কোনো কোনো ভিন্ন গোত্রের মধ্যেও বিবাহ চলে না (যেমন কিসকু ও মারনদী গোত্রদ্বয় পরস্পর বৈরীভাবাপন্ন) ফলে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ হয় না। তবে হুরকাটারা বা ইততু বিয়েতে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। Bhowmic এর মতে প্রাচীনকালে তাদের মধ্যে ৯ ধরনের বিবাহ প্রচলিত ছিল (Bhomic,1971:170) কিন্তু গবেষণাধীন এলাকায় ৪ ধরনের বিবাহ দেখতে পাওয়া যায় সেগুলো নিম্নরূপ:

১. কিরিন বাহু/ডাঙ্গুয়া বাপলা বা আনুষ্ঠানিক বিবাহ
২. আঙ্গির বাপলা বা প্রেমঘটিত বিবাহ
৩. অ-র বাপলা বা বল পূর্বক বিবাহ এবং
৪. ইততু বাপলা বা কৌশল বিবাহ।

১. **কিরিন বাহু/ডাঙ্গুয়া বাপলা –** বর-কনের অভিভাবকদের পছন্দ মাফিক যে বিবাহ তাকে ডাঙ্গুয়া বাপলা বলে।
২. **আঙ্গির বাপলা –** যুবক-যুবতীদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠলে এর ফলশ্রুতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ ধরনের বিবাহই সাঁওতাল সমাজে আঙ্গির বাপলা বা প্রেমঘটিত বিবাহ নামে পরিচিত। বর্তমানে এ ধরনের বিবাহের সংখ্যা খুবই কম।
৩. **অ-র বাপ্লা বা বলপূর্বক বিবাহ –** কোনো সাঁওতাল যুবক কোনো সাঁওতাল যুবতীর প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে অথচ যুবতীটি তাকে পছন্দ করে না, সেক্ষেত্রে যুবকটি কৌশল বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মেয়েটির কপালে সিঁদুর মাখিয়ে দেয়, একবার কোনো সাঁওতাল যুবক কোনো যুবতীর কপালে সিঁদুরের চিহ্ন দিতে পারলে সে যুবকের সঙ্গে বন্ধন খণ্ডন করা কঠিন হয়ে পড়ে, এ ধরনের ঘটনা ঘটলে গ্রামের মাঝিহাড়ম উভয় পরিবারের অভিভাবকদের সামনে যুবতীর মতামত প্রকাশের জন্য সভার আয়োজন করে। যুবতী যদি সম্মতিজ্ঞাপন করে তাহলে বিবাহের কোনো বাকি থাকে না ।
৪. **সাঙ্গা বাপলা –** এটি হচেছ বিধাব বা স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলার বিবাহ।

বিয়ের ক্ষেত্রেও সাঁওতালদের মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, এখন একজন ছেলে কোন মেয়েকে পছন্দ করলে গীর্জায় তাদের নাম টাঙানো হয় এবং প্রতি রবিবার করে ৪ রবিবার ধরে পাদ্রী, ছেলে ও মেয়ের নাম বলে এবং কারো এ বিয়েতে আপত্তি আছে কিনা তার ঘোষণা দেন। যদি কারো এই বিয়েতে কোন আপত্তি থাকে তবে তা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত এ বিয়ে হয় না ।

টোটেম ও ট্যাবু

আদিবাসী সাঁওতালদের সমাজে টোটেম ও ট্যাবু বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, সাঁওতালদের সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনি অনুযায়ী তাদের আদি পিতা পিলচুহাড়ম আর আদি মাতা পিলচুবুড়ির সাত জোড়া সন্তান-সন্তুতি থেকেই তাদের বংশোদ্ভব হয়েছে এবং তখন থেকেই গোত্র বিভাগের সূত্রপাত। হিহিহি-পিপিড়ি দ্বীপে অবস্থানকালে তারা ৭টি গোত্রে বিভক্ত ছিল, যথা-হাসদা, মুরমু, কিসকু, হেমব্রম, মারান্ডি, সরেন এবং টুডু। সেখান থেকে তারা যখন সসানবেদায় যায় তখন তাদের মধ্যে আরও ৫টি গোত্রের সৃষ্টি হয়, সেগুলো- বাস্কে, বেসরা, পাউরিয়া, চোড়ে এবং বেদিয়া, তবে বেদিয়া নামক গোত্রটি অনেক আগেই বিলিন হয়ে গেছে তা সাত্তারের লেখা থেকে পাওয়া যায় (সাত্তার,২০০৭:১৭৫)।

সারণি-২: উপগোত্র সংখ্যা

গোত্রের নাম	হসদা	মুরমু	কিসকু	হেমব্রম	মারান্ডি	সরেণ	টুডু	বাস্কে	বেসরা	পাউড়িয়া	চোড়ে	বেদিয়া
উপগোত্রের সংখ্যা	১৫	২৮	১৫	১৮	২৭	২৩	১৯	১৩	১৪	১৩	১৫	

সূত্র – Campbell, 1916:495-496

সারণি-৩: বৃত্তি বিভাগ

গোত্র	বৃত্তি
হাসদা ও টুডু	লোহার জিনিসপত্র তৈরির কাজ এবং উৎসবে নাকাড়া মাদল প্রভৃতির বাদক
মুরমু	পুরোহিত
কিসকু	রাজ্য শাসক
হেমব্রম	কুমার/দেওয়ানের কাজ
মারান্ডি	কৃষিকাজ
সরেণ	সৈনিক

সূত্র – বাস্কে,১৯৯৯:১৯৩

সারণি-৪: ধর্মীয় প্রতীক টোটেম

গোত্র	ধর্মীয় প্রতীক/ টোটেম
হাঁসদা	ঘাঁস
কিসকু	শঙ্খচিল
মুরমু	নীল গাই
মারাি	মেরদা নামক ঘাস
হেমব্রম	সুপারি
সরেণ	সপ্তর্ষি
বাস্কে	পান্তাভাত
বেসরা	বাজপাখি
চোড়ে	গিরগিটি
পাউড়িয়া	পায়রা

সূত্র: বাস্কে, ১৯৯৯:১৯৩

প্রাচীনকালে সাঁওতালদের গোত্রসমূহের মধ্যে বিভিন্ন কৌলিক বৃত্তি ছিল (বাস্কে,১৯৯৯:১৯৩) কিন্তু বর্তমানে তাদের মধ্যে এ ধরনের কর্মবিভক্তি দেখা যায় না। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে এবং সময়ের প্রেক্ষিতে তাদের সামগ্রিক জীবনযাপনে যে নিদারুন দু:খ-কষ্টের সৃষ্টি হয়েছে তাতে তারা আদিতম বৃত্তিগুলো পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে। গবেষণাধীন এলাকায় অধিকাংশই কৃষিজীবী ও দিন-মজুর তবে শহরে বসবাসরতরা চাকুরিজীবী। সারণী -৪ এ বিভিন্ন গোত্রের ধর্মীয় প্রতীক/টোটেম চিহ্নের উলেণ্ডখ রয়েছে, এখানে দেখা যায় কোন কোন গোত্রের সাথে ট্যাবুর সর্ম্পক বিদ্যমান, যেমন-হাঁসদা গোত্রের লোকেরা হাঁসের মাংস ও ডিম খায় না (সুলতানা-২০০২:১৬৩)।

গর্ভবতী মহিলাবিষয়ক ট্যাবু

এ ক্ষেত্রে একজন সাঁওতাল গর্ভবতী নারীকে অনেক নিয়ম পালন করতে হয়, যেমন- কোন প্রাণী হত্যা করা যাবে না, নদী পার হতে পারবে না, মাথার চুলে ফুল পরতে পারবে না ও বোঙ্গাদের জায়গায় শুতে পারবে না প্রভৃতি ।

দৈনন্দিন কাজ সম্পর্কিত ট্যাবু

দৈনন্দিন জীবনে সাঁওতাল মেয়েদের কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয় যথা-মেয়েরা এমন কোন কাজ করতে পারে না, যা সচারাচর পুরুষরা করে থাকে, যেমন- সাঁওতাল মেয়েরা লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করতে পারে না, এমনকি তা স্পর্শ করতে পারে না। তীর নিক্ষেপ ও বাঁশি বাজান হতে বিরত থাকে। তারা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পৌরাহিত্য করতে পারে না।

খাদ্যবিষয়ক ট্যাবু

সাঁওতালরা ধর্মীয় প্রথা অনুসারে ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল, বাঘ ও কাকের মাংস খেতে পারে না। কিছু কিছু গোত্র মাছি ও হাঁস খেতে পারে না। চাল যেহেতু বোঙ্গার খাদ্য তাই তা রান্না ব্যতিত খাওয়া যায় না। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বলি দেয়া প্রাণীর মাথা নায়েকে বা মাঝিহাড়ম ছাড়া অন্য কেউ খেতে পারে না। সাঁওতালরা ধর্মের পূর্বে পালনীয় ট্যাবুগুলো এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আর পালন করে না। এসব জায়গায় অনুপ্রবেশ ঘটেছে খ্রিস্টান ধর্মের বিশ্বাস ব্যবস্থা ও আদর্শ, শিক্ষিতরা এখন এগুলোকে কুসংস্কার বলতে দ্বিধা বোধ করে না।

চিকিৎসা

সাঁওতালরা চিকিৎসার জন্য ওঝার উপর নির্ভরশীল। ওঝা মন্ত্রপূত, তেল-জল, গাছ-গাছড়া ও লতাপাতার তৈরী ঔষধ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা করে। সাধারণত আধুনিক চিকিৎসার শরণাপন্ন না হওয়ার কারণ আর্থিক অস্বচ্ছলতার চেয়ে ওঝার ওপর তাদের আজন্ম বিশ্বাস ও সংস্কারেরই প্রভাব বেশি। অনেক সময় ওঝা তার চিকিৎসা ফি ও ঔষধ মূল্য হিসাবে অসুস্থ ব্যক্তির কাছ থেকে মদ গ্রহণ করে। ধর্মান্তরিতদের মধ্যে এ ধরনের বিশ্বাস আস্তে আস্তে লোপ পাচ্ছে এবং আধুনিক চিকিৎসার প্রতি তারা আকৃষ্ট হচ্ছে। এখন তারা চিকিৎসার জন্য খ্রিস্টান মিশন হাসপাতালে যায়। এছাড়াও মিশন কর্তৃক পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে তারা আধুনিক চিকিৎসা নিচ্ছে।

সমাজ কাঠামো

কালের স্রোতে সাঁওতাল সমাজের রূপান্তর ঘটলেও তারা স্ব-সমাজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছে। ঐতিহ্যবাহী সামাজিক নেতৃত্ব এখনও বহাল আছে। তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনে গ্রাম সংগঠনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাঁওতালরা তাদের সমাজে সংঘটিত যে কোনো ধরনের অপরাধের বিচার স্ব-সমাজের প্রধানদের দ্বারাই সমাধান করার পক্ষপাতি, এ ক্ষেত্রে অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে বিভিন্ন স্তরের বিচারালয়ে বিচার সম্পন্ন হয়-

গ্রাম পঞ্চায়েত – সাঁওতালদের বিচার ব্যবস্থার প্রথম বা প্রাথমিক স্তরে রয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্য সংখ্যা পাঁচ জন যথা মাঞ্চঝি বা মাঝিহাড়ম (গ্রামের প্রধান), জগপারাণিক (মাঝির সহকারী), জগমাঝি (নৈতিকতার অভিভাবক), নাইকে (পুরোহিত), কুড়াম নাইকে (সহকারী পুরোহিত) এবং গোরেথ (সংবাদ বাহক)।

পরগনা পঞ্চায়েত – বিচার ব্যবস্থার দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে পরগনা পঞ্চায়েত। আশে পাশের কয়েকটি গ্রামের প্রধান তথা মাঝিহাড়মদের নিয়ে গঠিত হয় পরগনা পঞ্চায়েত। এর প্রধানকে বলা হয় পরগানা।

দেশ প্রধানের পঞ্চায়েত – তৃতীয় স্তরে দেশ প্রধানের পঞ্চায়েত। সাঁওতালরা তাদের বসবাসের নির্দিষ্ট এলাকাকে দেশ বলে অভিহিত করে। এর প্রধানকে বলে দেশ প্রধান, তার অধীনে ৫/৬ বা ততোধিক পরগানা ও মাঝি হাড়ম থাকে।

ল'বীর বা জঙ্গল মহাসভা – সাঁওতালদের সর্বোচ্চ আদালতকে বলা হয় ল'বীর। এ আদালত বছরে একবার বসে, এতে এলাকার সকল অমিমাংশিত জটিল সমস্যা উত্থাপিত হয় এবং সকলের আলোচনার প্রেক্ষিতে সেসব সমাধান করা হয়।

খ্রিস্টান সাঁওতালদের মাঝে সাঁওতাল সমাজ কাঠামো ও ব্যবহারের কোন অস্তিত্ব নেই। সংশিণ্ডষ্ট ফাদার পছন্দনীয় ব্যক্তিকে ওই এলাকার প্রার্থনাকারী তথা বিকল্প মাঝিহাড়ম হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে বিকল্প নেতৃত্ব কাঠামো দাঁড় করেছেন, তাদের সমাজ ব্যবস্থায় পঞ্চায়েত পরগোনা সংগঠন, দেশ প্রধান, ল'বীর ইত্যাদি কাঠামো স্তর যেমন বিলীন, তেমনি তাদের নেতৃত্ব ব্যবস্থাও হুমকির মুখে।

সামাজিক উত্তরাধিকার ও কৃষিকর্ম

সাঁওতালরা মূলত পিতৃতান্ত্রিক, পিতার গোত্র ও সামাজিক পরিচয় সন্তানের ওপর বর্তায়, বিধায় পিতার মৃত্যুর পর স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি ছেলেদের মাঝে বণ্টন হয়। ছেলে-সন্তানের অনুপস্থিতে সম্পত্তি মৃত ব্যক্তির ভাইদের মাঝে, আর ভাইদের অনুপস্থিতে পিতার নিকটতম পুরুষ

আত্মীয় সম্পত্তি পায় তবু মেয়েরা কোনো সম্পত্তি পায় না। পিতার জমিতে মেয়ের কোন অধিকার নেই, তবে ঘরজামাই তার স্ত্রীর পিতার ভাগ পেয়ে থাকে, আবার ছোট নাবালিকা সন্তান নিয়ে বিধবা মহিলা ছেলের অভিভাবক হিসেবে সম্পত্তি নিজ অধিকারে রাখতে পারে। বাড়ী ছাড়া, সম্পত্তি ভাগ হয়ে থাকে, মেয়েকে শুধু বিয়ের সময় একটি গাভী ও নগদ কিছু অর্থ উপহার দেয়া হয়। পিতার যদি শুধু কন্যা হয় সেক্ষেত্রে মেয়ে বিবাহিত হলে এবং তার পুত্রসন্তান থাকলে সে পিতার সম্পত্তি পাবে কিন্তু যদি মেয়ের মেয়ে হয় অর্থাৎ নাতনী হয় তাহলে সে মেয়ে সম্পত্তি পাবে না, এক্ষেত্রে সম্পত্তি সংশিণ্ডষ্ট ব্যক্তির ভাইয়েরা পাবে।

গবেষণায় দেখা যায় সাঁওতালদের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা পরিবর্তনের পাশাপাশি তাদের বৈষয়িক পরিবর্তনও এসেছে। পিতৃসূত্রে জমির মালিকানা লাভ করেছে এমন স্বচ্ছল পরিবার খুব কম। তবে অনেকেই চাকুরী বা অন্য কোন পেশায় জড়িত হবার পর জমি কিনেছে।

মৃত্যুবিষয়ক অনুষ্ঠান

সাঁওতাল সমাজে কেউ মারা গেলে মাঝিহাড়ম সে সংবাদ গোড়েথ-এর মাধ্যমে গ্রামের সবাইকে অবগত করে। কাঠ ও খড়ির দুস্প্রাপ্যতা এবং মূল্যবৃদ্ধির কারণেই মৃতদেহকে দাহ করার রীতি থাকলেও বর্তমানে তা কবরস্থ করা হয় । কবরস্থানে পৌঁছানোর পর তিনবার সে জায়গা প্রদক্ষিণ করে মৃতদেহকে দক্ষিণমুখী করে রাখা হয়, কবর খননকারী মৃতব্যক্তির ডানহাত ও পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের নখ, মাথার সামান্য চুল ও পরিধেয় বস্ত্রের কিছু অংশ কেটে তার নিকট আত্মীয়ের হাতে তুলে দেয়, তারপর কবরের কিছু মাটি, পানি দিয়ে মেখে একটি গুটির মতো তৈরি করে। এ গুটি এক প্রকার ঘাসের শলাকা ও সুতো দিয়ে জড়িয়ে আগুনে গরম করে তা মৃতব্যক্তির মুখে স্পর্শ করা হয়। এরপর মৃতদেহকে কবরে নামিয়ে দেয়া হয়, কবরস্থ করার সময় তারা পাঠ করে-হাসা হড়মে হাসারে মিলাক অর্থাৎ ও হে মাটির মানুষ মাটিতেই মিশে যাও।

সাঁওতালদের মৃত্যুকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানগুলোতে ফাদাররা খ্রিস্টান রীতি অনুসারে তার যাবতীয় কাজ পরিচালনা করে, আগে মৃতদেহ পোড়ানো হলেও এখন মাটি দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তিকে মাটির গর্তে বসিয়ে একটা লাঠির সঙ্গে বেঁধে মাটি দেওয়া হয়। মাটি দেওয়ার সময় কবরস্থানে ছেলেমেয়ে সবাই যেতে পারে।

সংস্কৃতি পরিবর্তনে ক্রিয়াশীল উপাদানসমূহ

সাংস্কৃতিক পরিচলন

কোন মানবগোষ্ঠী অপর এক গোষ্ঠীর সকল সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে খুব সহজে গ্রহণ করতে চায় না, তথাপি সংস্কৃতি ব্যাপ্তির (Diffusion) ফলে দুটি ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে আদান-প্রদান বহুসময় খুব স্বাভাবিকভাবেই ঘটে, যখন দুই ধরনের সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পারিক সংযোগ ঘটে তখন এক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মানুষ অপর সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে চিন্তাধারার আদান-প্রদান ঘটায়। এই পদ্ধতির নাম সাংস্কৃতিক পরিচলন (Accultration)। এটি মানব সমাজে অতি সাধারণ ঘটনা, সাধারণত দেখা যায়, অগ্রসর জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির দ্বারা অনগ্রসর গোষ্ঠী অধিকমাত্রায় অনুভাবিত হয় অর্থাৎ ক্ষুদ্রাকৃতির সমাজ ও সংস্কৃতি যতই পারিপার্শ্বিক প্রবল সমাজের সংস্পর্শে আসে ততই বৃহৎ সমাজে অত্মীকরণ ও সাংস্কৃতায়নের চাপে পড়ে। ফলে একদিকে গ্রহণ অন্যদিকে বর্জন ক্রিয়া চলে, এরই পাশে নিজ সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য কিছু উপাদানকে সংশোধন করে নেয়।

যোগাযোগের উন্নতি এবং আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনে বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ বেড়ে চলায় বর্তমানে এই ধরনের সাংস্কৃতিক পরিচলন খুব বেশি মাত্রায় ঘটছে। আদিবাসীদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, আচার-ব্যবহার, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি রয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে বাঙালি মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসার ফলে এরা ক্রমাগত ভিন্নতর সাংস্কৃতিক উপাদান সংহরণ করে চলছে। এতে তাদের জীবনের মান, সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতা বহুমাত্রিকতা লাভ করেছে। এই ধরনের ভিন্নতর সংস্কৃতি গ্রহণ বা সংস্কৃতির পরিচালন তীব্রভাবে দেখা দিলে সমগ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক আত্মীকরণ ঘটে অর্থাৎ আদিবাসী গোষ্ঠী তখন নিজস্বতা হারিয়ে সামাজিক বিঘটনের (Social disorganisation) শিকার হয়ে পড়ে। গবেষিত এলাকায় সাঁওতাল জনগোষ্ঠী ক্ষুদ্রাকৃতি সমাজ হিসাবে বাস করে আপন স্বাতন্ত্রতা নিয়ে কিন্তু তারা ক্রমশই পারিপার্শ্বিক প্রবল বাঙালি ও খ্রিস্টান মিশনারীদের সংস্পর্শে আসছে, ফলে তাদের সামাজিক ঐক্য দুর্বল হচ্ছে যা খুব সহজেই অন্য সংস্কৃতি গ্রহণ করার পক্ষে সহায়ক।

জাত্যভিমানের অভাব

কোন একটি জাতিগোষ্ঠীর মানুষ যখন আপন জাতিকে অপর জাতি বা গোষ্ঠীর তুলনায় উচ্চতর এবং শ্রেষ্ঠতর মনে করে, তখন তাকে জাত্যভিমান (Ethnocentrism) বলা হয়, নৃবিজ্ঞানে সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতার যে ধারণা রয়েছে তার বিপরীতে অবস্থিত জাত্যভিমানের ধারণা। সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতায় বলা হয় প্রতিটি জাতি বা গোষ্ঠির নিজের সংস্কৃতিকে সেই সংস্কৃতির মানদন্ডে বিচার করা উচিত কিন্তু জাত্যভিমানের অভিব্যক্তি এই অবস্থানকে প্রশ্নচিহ্নিত করে দেয়। যে চিরায়ত সাঁওতালরা পূর্বে তাদের সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম নিয়ে গর্ববোধ করত আজ তা অনেকাংশে ক্ষীয়মান। গবেষণাধীন এলাকায় সাঁওতালরা দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি মুসলমান, হিন্দু এবং খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সাথে বসবাস করছে, এ সকল শক্তিশালী সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে সাঁওতালরা নিজেদের খাদ্য, ভাষা, ধর্ম, জাতি ও সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ ভাবতে পারছে না কারণ স্বজাত্যবোধের অভাব, স্বজাত্যবোধ না থাকার পেছনে কতিপয় কারণকে চিহ্নিত করা যায় এগুলো - সাঁওতালদের অশিক্ষা, অজ্ঞতা, ধর্মীয় জ্ঞান ও চর্চার অভাব, চিরায়ত নেতৃত্বে অসহায়ত্ব এবং দরিদ্রতা। সাঁওতালদের সংস্কৃতিকে মিশনারী ও আরো অনেক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হেয় প্রতিপন্ন করা হয় আর সাঁওতালরা সে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অক্ষম হবার ফলে ক্রমান্বয়ে তাদের স্বজাত্যবোধের ধারণা দুর্বল হয়ে পড়ছে।

স্থানিকতাবাদ না থাকা

চিরায়ত সাঁওতাল সংস্কৃতি পরিবর্তনের অন্যতম অন্তস্থ উপাদান হলো তাদের মধ্যে স্থানিকতাবাদ না থাকা। স্থানিকতাবাদ হল এমন এক বিদ্যা যা কোন জাতি তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক উপাদান ও মূল্যবোধকে চিরস্থায়ী করে, অথবা বিলুপ্ত বা ক্ষীয়মান সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহকে পুনর"জ্জীবিত করার প্রয়াস চালায়, কিন্তু দু:খজনকভাবে সাঁওতাল সমাজে তা অনুপস্থিত। কারণ প্রতিবেশী বৃহৎ বাঙালি জনগোষ্ঠী এবং খ্রিষ্টান মিশনারীদের অবাধ সংশিণ্ডষ্টতা। ধর্মান্তর প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করে নিজস্ব সংস্কৃতিকে সমুন্নত রাখার কোন প্রচেষ্টা সাঁওতালদের মধ্যে দেখা যায় না, ফলে ক্রমাগতভাবে সাঁওতাল সংস্কৃতি পরিবর্তীত হচ্ছে, সাঁওতালদের চিরায়ত ঐতিহ্য অনুসারে যদি নাচ, গান, কবিতা, রচনা, গল্পকথা ইত্যাদির মাধ্যমে সৃষ্টিতত্ত্ব, ধর্ম বা জাতিগত উপাখ্যান ইত্যাদি বিষয়ে বাৎসরিক কিংবা উৎসবকেন্দ্রিক প্রতিযোগীতার আয়োজন হত তাহলে তাদের সংস্কৃতি ও দর্শন সম্পর্কে মূল্যবোধ আরো গভীর হত। কিন্তু গবেষণায় এ জাতীয় কোন আয়োজন বা উৎসব কিংবা অনুষ্ঠানের

কথা পাওয়া যায় না। ফলে স্বাভাবিকভাবে সাঁওতালরা হতাশ অর্থাৎ স্থানিকতাবাদ বা স্বজাত্যবোধ-স্বজাতিকতা বা স্ব-জাতীর প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধ সৃষ্টি হবার কোন সক্রিয় ও বলিষ্ট উদ্যোগ গবেষণাধীন এলাকায় নেই।

সংস্কৃতির আন্তর্জাতিকীকরণ

বিজ্ঞানের অভূতপূর্ণ উন্নতি ও নিত্য নতুন আবিস্কার মানুষকে নিয়ে গেছে নতুন এক উচ্চতায়। এসব আবিস্কার নির্দিষ্টভাবে কোন দেশ বা জাতির নয় ফলে সংস্কৃতির উপাদানগুলো হয়ে উঠেছে সার্বজনীন। তবে এ কথা সত্য যে, বিজ্ঞানের দ্বারা উদ্ভূত অনেক সংস্কৃতি স্থানীয় সংস্কৃতির মূল্যবোধকে ধারণ করেনা, ফলে অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কৃতির উন্নত ভাব সুর"চির জন্ম দিতে ব্যর্থ হয় আর এই অপসংস্কৃতি স্থানীয় মূল সংস্কৃতিকে নষ্ট করে। গবেষণাধীন এলাকায় এর সত্যতা পাওয়া যায়, একজন তথ্যদাতার মতে সাঁওতাল দিনমজুররা -পূর্বে কৃষিকাজের ক্ষেত্রে কাজের ফাঁকে বাঁশি বাজাত কিংবা গান গাইত কিন্তু বর্তমানে তারা শার্টের পকেটে মোবাইল রেখে গান শুনছে অথবা হেডফোন দিয়ে গান শুনছে কিংবা মোবাইলে ছবি দেখছে, নাচ-গান-আনন্দ আর উলণ্ডাস সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান হলেও বর্তমানে নাচ-গানের পরিবর্তে সিনেমা, টেলিভিশন এবং ডিস সে স্থান দখল করে নিয়েছে। বহিরাগত সংস্কৃতির ভালো-মন্দো নিয়ে বির্তকে যাব না, তবে একথা সত্য বহিরাগত সংস্কৃতি সাঁওতাল মূল সংস্কৃতিকে অনেকাংশে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

বিকল্প নেতৃত্ব কাঠামো

সাঁওতালদের সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো বিশেণ্ডষণ করলে দেখা যায়, মাঝিহাড়ম কে কেন্দ্র করে গ্রামের সকল কর্মকা" পরিচালিত হত। এখন মাঝিহাড়মের নেতৃত্ব গুর"ত্ব দিয়ে কেউ মানে না, যা পূর্বে সাঁওতাল সমাজে অবাস্তব ও অসম্ভাব ছিল। মাঝিহাড়ম মৃত্যুর পূর্বে তার বড় ছেলেকে দায়িত্ব দিয়ে যেত, কিন্তু বর্তমানে মাঝিহাড়ম নির্বাচিত হয় ফাদারের মতানুসারে । আর ফাদার কখনোই অ-খ্রিস্টান কাউকে মাঝিহড়ম নির্বাচন করে না। ফলে দেখা যায় চিরায়ত সাঁওতাল আর খ্রিস্টান সাঁওতালদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে। গবেষণাধীন এলাকায় জানা যায়, তাদের পরগণা পরিষদ এতই শক্তিশালী ছিল যে, এ পরিষদের অনুমতি ছাড়া কেউ কখনো থানায় কোন মামলা করতে পারত না, কিন্তু বর্তমানে এ পরিষদের কার্যত আর কোন ক্ষমতা নেই।

উপসংহার

সাঁওতাল জনগোষ্ঠঅ তাদের নিজস্ব সকল ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার থাকা সত্ত্বেও পরিবর্তনের ধারাকে উপেক্ষা করতে পারছে না। রাজশাহী এলাকার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক রূপান্তর, খ্রীস্টধর্মের প্রচার, রাজনৈতিক দলের বিকাশসহ আধূনিক জীবন-যাপনের বিভিন্ন উপাদানকে পরিবর্তনের মৌল নিয়ামক হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও বর্তমান বিশ্বায়ন নামক নতুন এক আগ্রাসনকে আদৌ অবহেলা করা সম্ভাব নয়। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, বিশ্বায়ন বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মারাত্নক স্ববিরোধীতা সৃষ্টি করবে যার প্রভাব থেকে একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠি হিসেবে নিম্নবর্গের সাঁওতালদের মুক্ত থাকা অসম্ভব বলে মনে হয়।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ:

Ali,Md.Ahsan,1989, *Social Changes Among the Santals of Bangladesh:A Study of Cultural Isolation"* caltutta University

Bhowmic,K.L. 1971,*Tribal India: A Profile in Indian Ethnology*,Calcutta. The World Press Private Ltd.

Bessaignet,P,1960, *Tribes of Northern Disttict of East Pakistan, social research in East Pakistan*.Dhaka, Asiatic societic of Pakistan.

Bodding, P.O.,1994, *Traditions and Institutions of the Santal*,New Delhi, Bahumukhi Prokasan.

Dalton,E.T., 1973, *Descriptive Ethnology of Bengal*, Calcutta: Government Press.

Datta Majumder, N.1956, *The Santal: A Study in Culture Change,* Delhi: Manager of Publication.

Haviland,W.A, 1906,4th edition, *Cultural Anthropology*,U.S.A

Hunter,W.W. 1868,*The Annals of Rural Bengal*, London:Smith Elder and Com.

Karim, A.H.M. Zehadul,2000, *æThe Socio-Economic Condition and the Subsistence Activities of Santal in the Adjoining Rajshahi periurban areas*",Seminar Paper on Tribal Cultural and Development, Dhaka.

Mallick,S.K, 1993, *æTransformation of Santal Society : Prelude in Bharhind*"Calcutta,Minerva Associates Publication.

Qureshi, Mahmud Shah eds. 1984, *Tribal Cultures in Bangladesh*, IBS Seminar, Vol.V, IBS,Rajshahi University.

Risley,H.H. 1891, *The Tribes and Castes of Bengal*. 2 Vols. Calcutta, The Bengal Secretarial Press.

কায়েস, শাহানা, ১৯৯৫, *রাজশাহী জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন : একটি নৃতাত্ত্বিক গবেষণা*, আই .বি .এস. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

গুহ, বি.এস. ১৯৬৫, *এ্যান আউটলাইন অব দি রেসিয়্যাল এথনোলজি অব ইন্ডিয়া*, কলিকাতা।

চক্রবর্তী, বরুণ কুমার (সম্পা),২০০৯, *লোকসংস্কৃতি ও নৃবিদ্যার অবিধান*, কলিকাতা।

জলিল, মুহাম্মদ আবদুল, ১৯৯১, *বাংলাদেশের সাঁওতাল : সমাজ ও সংস্কৃতি*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি ।

বাস্কে, ধীরেন্দ্রণাথ, ১৯৯৯, *"সাঁওতাল" পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসি সমাজ*, ১ম খ", কলিকাতা, সূবর্ণরেখা।

মলিণ্ডক, সমর কুমার, ১৯৮৮, *"ঊনবিংশ শতকে সাঁওতাল প্রতিবাদী আন্দোলনের স্বরূপ"* ইতিহাস মিত্র, সনৎকুমার (সম্পা), ১৯০৭, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ১৯বর্ষ, ২সংখ্যা, কলিকাতা অনুসন্ধান-৩,কলিকাতা, কে পি এ" কোম্পানী।

সমাদ্দর, রণজিৎ কুমার , ১৯৯২, *সাঁওতাল গণযুদ্ধ ও বাংলা সাহিত্য*, কলিকাতা, চাটার্জী পাবলিশার্স।

সাত্তার, আব্দুস, ১৯৬৬, অরণ্য জনপদে, ঢাকা, জলি বুকস।

সেন, সূচিব্রত, ১৯৯৩. *"সাঁওতাল বিচ্ছিনতাবাদের উৎস সন্ধানে" ইতিহাস অনুসন্ধান*-৭, কলিকাতা, কে.পি.বাগচি এন্ড কোম্পানি।

সুলতানা, মোসাঃ আবেদা, ২০০২, *"সাঁওতাল সংস্কৃতিতে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রভাব ঃ রাজশাহী জেলার পাঁচটি গ্রামের উপর একটি নৃতাত্ত্বিক গবেষণা "* আই.বি.এস.রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সুলতানা, শাহনাজ, ২০০৩,*"সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জ্ঞাতি সম্পর্ক এবং এর সাম্প্রতিক পরিবর্তন ঃ নঁওগা জেলার ৪ টি গ্রামের উপর গবেষণা"* নৃবিজ্ঞান বিভাগ,রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সামাদ,এবনে গোলাম, ১৯৯৯, *রাজশাহীর ইতিবৃত্ত*, রাজশাহী।

সরকার, প্রফুলণ্ড চন্দ্র,১৯৯৮,*বরেন্দ্র অঞ্চলের আদিবাসী: বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, রাজশাহী।

সরকার, হারুন-অর-রশীদ, ২০০৭, রাজশাহীর আদিবাসী সম্প্রদায়: ধর্মান্তর ও সাংস্কৃতিক সংকট,পরিলেখ, রাজশাহী ।